জবানবন্দি

জন্মসূত্রে বাবার দলকে ধারন করছি। সেই সূত্রে রাজনীতিতে হাতেখরি ২০০৪ সালে এবং বাবার মৃত্যুর পর বারেবারেই দলীয় মনোনয়ন চাইছি। প্রথম তিনবার দলীয় মনোনয়ন পেতে ব্যার্থ হলেও মাঠের রাজনীতিতে সক্রিয় থাকার কারণে মনে বড় আশা ছিল দলীয় স্বীকৃতি কিছু একটা পেয়ে যাবো। পাইনা তো পাইলামই না। মনে কিছু দুঃখ বোধ যে কাজ করেনি তা নয়। এর মাঝে অবশ্য একটা ছোট্ট আশ্বাস বাণী পেয়েছিলাম যে, ২০১৪ সালের নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন পাবো। ২০১৩ সালের শেষের দিকে সংসদীয় নির্বাচনের মনোনয়ন প্রক্রিয়া শেষ হল, তালিকায় আমার নাম নেই। কি আর করা। প্রতিবারের মত মনোনয়ন দাখিল ক'রে রাখলাম এই আশায়, যদি কোন কারণে দলের মত বদলায় অথবা যাকে মনোনয়ন দেয়া হ'য়েছে তারটা বাতিল হয়।

হঠাৎ মনোনয়ন প্রত্যাহারের আগেরদিন সন্ধ্যায় আমাদের সুনামগঞ্জ আওয়ামীলীগ সভাপতি ফোন দিয়ে জানালেন, আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে স্বতন্ত্র নির্বাচন করবার জন্য। বলে কি!! ১৫৩টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হ'য়ে দলের ক্ষমতায় আসা নিশ্চিত, সেখানে কিনা আমাকে স্বতন্ত্র করতে বলা হয়েছে!! সাথে সাথে বড়ভাই তুল্য জনাব ওবায়দুল কাদেরকে এবং আমার আরেক মুরুব্বী বাবু সুরঞ্জিত সেন গুপ্তকে ফোন দিয়ে জানালাম বিষয়টা। দু'জনেই জিজ্ঞেস করলেন কে বলেছে। আমি তার নাম বলতেই ওনাদের দুজনই প্রায় একই রকম উত্তর দিলেন, সে যদি বলে থাকে তাহলে তো দায়ীত্ব নিয়েই বলেছে। আমি বললাম, আমি ওনার কথায় এতো বড় একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারছিনা। আগামীকাল বিকেলের মধ্যে দলীয় হাইকমান্ডের নির্দেশটা আপনাদের মুখ থেকে জেনে নেবো।

পরেরদিন বিকেলে প্রথমেই কাকা বাবুকে ফোন দিলাম, ফোন ধরলেননা, একটু ঘাবড়েই গেলাম। দিলাম কাদের ভাইকে ফোন, উনি ফোন ধরেই বললেন, তোমাকে স্বতন্ত্র করতে বলা হয়েছে কিন্তু জিতে আসতে হবে। আমি দেখবো যাতে ইলেকশন ফ্রি এন্ড ফেয়ার থাকে। কি আর করা। ঢাল নেই তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দারের মত নেমে পরলাম নির্বাচনে। দল নেই, কর্মী নেই, টাকা নেই, সময় নেই। মাত্র বিশ দিনে সব গোছাতে হবে। আমার আসনের সাধারন মানুষের সহযোগীতায় গুছিয়েও ফেললাম। এর মাঝে নির্বাচন শুরু হবার প্রথম সপ্তাহেই উৎসাহিত হবার মত একটা ঘটনা ঘটলো। কেন্দ্র থেকে চিঠি এলো কেন্দ্রীয় উপ-কমিটির সহসম্পাদক করা হয়েছে আমাকে। ব্যাস, ঐ উৎসাহেই হুড়মুড় করে কেটে গেলো আরেক সপ্তাহ।

নির্বাচন যতই ঘনিয়ে আসতে লাগলো ততই বাতাসে ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাওয়া শুরু করলাম। নির্বাচনের দুইদিন আগে সব ষড়যন্ত্রের কথা জানালাম আমার রাজনৈতিক বড় ভাইকে। উনি ব্যবস্থা নেয়ার আশ্বাস দিলেন। বিশ্বাস করতেই হয়, হাজার হলেও বড় ভাই। আরে ধুর, কিসের আশ্বাস আর কিসের বিশ্বাস, প্রশাসন লেলিয়ে দিয়ে আমার কর্মীদের দাঁড়াতেই দেয়া হ'ল না। অবশ্য জনতার প্রতিরোধের মুখে প্রশাসন কিছু করতে না পারায় ভোটকেন্দ্রের হিসেবে জিতলাম বারো হাজার ভোটে কিন্তু কারসাজি করে নির্বাচনী ফলাফল ডিসি অফিসে এসে আটকে গেল। মাঝরাতে ঘোষনা দেয়া হ'ল আমি চার হাজার ভোটের ব্যবধানে পরাজিত।

ঢাকায় এসে প্রথমেই গেলাম কাকাবাবুর কাছে। উনি আমাকে দেখেই বললেন, আমি তোমার ফোন ধরিনি ইচ্ছে করেই, তোমাকে নির্বাচনের অনুমতি দেয়াটা আমার পছন্দ হয়নি, কিন্তু আমার পছন্দ অপছন্দের

তোয়াক্কা তুমি করবানা জানি, এখন যেহেতু কেন্দ্রীয় একটা পদ পেয়েছো, আশা নিয়ে বসে থাকো। কিসের আশা!! ১৬ সালের শেষে দল থেকেও বাদ, তবে ১৮ সালের নির্বাচনী মনোনয়ন থেকে বাদ পরলেও একটা সুখের ঘটনা ঘটলো। এই প্রথমবারের মত দলের সর্বোচ্চ নীতি-নির্ধারক দু'জন আমাকে ডেকে নিয়ে জানালেন, আগামী দিনের রাজনীতিতে তুমি থাকবে। জন্মসূত্রে আদর্শের রাজনীতি ধারন করছি, পদ-পদবীর মোহ না থাকলেও জনকল্যাণকর কাজে নিজ সক্ষমতা বাড়িয়ে তুলবার জন্য পদ-পদবীর প্রয়োজন আছে। নিজ স্বার্থচিন্তা থেকে এই প্রচেষ্টা যে নয় তার সবচেয়ে বড় প্রমান, বাবার মৃত্যুর পর উপনির্বাচনের সহজ বিজয় ভাবনাকে উপেক্ষা করেছি দলীয় শৃঙ্খলার প্রতি সন্মান প্রদর্শন পূর্বক দলীয় নির্দেশের প্রতি আনুগত্যের করণেই।

আমরা সেই দেশে বসবাস করি যেই দেশের সর্বোচ্চ পর্যায়ের আসনে আসীন হতে পারেন দেশের অস্তিত্ব অস্বীকারকারী মানুষ। কিন্তু দেশের ইতিহাস বিকৃতি হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক মানুষদের দ্বারাও। সেদিন দেখলাম সেরকমই একজন মানুষ, একজন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের মানুষের বন্দনা করতে যেয়ে অতি বন্দনা রোগে আক্রান্ত হ'য়ে যা ইচ্ছে বলছেন। যাকে নিয়ে বলছেন তার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বলতে চাই, মুক্তিযুদ্ধে ওনার মত ডিফ্যাক্টো ডিপ্লোম্যাট আরও অনেকে ছিলেন, সবচেয়ে বেশী ভূমিকা রেখেছেন যিনি সেই কলকাতার ডিফ্যাক্টো ডিপ্লম্যাট হোসেন আলী সাহেব, তিনি তো ইতিহাসের পাতাতেই আর নেই। অথচ মরহুম ডিফ্যাক্টো ডিপ্লোম্যাটের বন্দনা করতে যেয়ে বললেন, মুক্তিযুদ্ধে তিনি নাকি বিশাল ভূমিকা রেখেছিলেন, বিশ্বের ৪০টি দেশের স্বীকৃতি এনে দিয়েছিলেন ইত্যাদি। কোথায় পেলেন এসব তথ্য জানিনা, যদিও ডিফ্যাক্টো সাহেব পরবর্তিতে ইতিহাস বিকৃতকারী স্বৈরাচারদের সমর্থনে কাজ করেছেন, তাদের দেয়া পদ-পদবী নিয়ে ইতিহাস বিকৃতিতে সহায়তা করেছেন সেটা ইচ্ছে করেই মনে হল তিনি এড়িয়ে গিয়েছেন।

আমরা সেই দেশে বসবাস করি যেই দেশের সাধারণ মানুষের মুখের ভাষার অধিকার আদায়ের সংগ্রামের কারণে বিদেশী স্বৈরাচারের রোশানলে পুড়ে হারাতে হয় সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের ডিগ্রী কিন্তু দুঃখের বিষয় জয়ী হবার পরেও ঐ অপরাধ থেকে তাদের মুক্ত করার কোন উদ্দ্যোগ নেয়া হয়না, তাদের ডিগ্রী ফিরিয়ে দেয়ার কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়না। এই সেই দেশ যেখানে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতাকারীরা বারে বারে মন্ত্রীত্ব পায়, সংসদ সদস্য হয়। এই সেই দেশ যে দেশে কোন দলের মনোনয়ন পেতে হলে সেই দলের কোন পর্যায়ে সদস্যপদ না থাকলেও চলে। এই সেই দেশ যে দেশে স্বৈরাচারের সহায়ক শক্তিরা বারে বারে নির্বাচিত হয়। এই সেই দেশ যেখানে দেশের ইতিহাসের নায়কদের বোমা মেরে উড়িয়ে দেবার পরিকল্পনা করেও ক্ষমতায় থাকা যায়।

বেশীদূর নয়, আমাদের জেলাতেই যাই। আমার জেলাতে দু'জন এমপি আমার জেলারই অধিবাসী নন। এই জেলার আরেক এমপি তো ২০০৮ সালের একদম শেষে এসেও আওয়ামীলীগের গ্রাম পর্যায়েরও আওয়ামীলীগার না থাকা সত্ত্বেও মনোনয়ন বাগিয়ে নিয়েছিলেন। আরেকজনের তো চৌদ্দগুষ্ঠী মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শুধু না মানবতা বিরোধী কর্মকান্ডেও জড়িত। এমনকি উনি নিজেও পাকিস্তানিদের সাথে কাজ করার জন্য বঙ্গবন্ধু কর্তৃক চাকুরীচ্যুত। আরেকজন বসে বসে বড় নেতা হয়ে গিয়েছেন। ৯০'এর স্বৈরাচার বিরোধী তুমুল আন্দোলনের সময় সকল বিরোধীদল যখন উপজেলা নির্বাচন বয়কট করলো তখন স্বৈরাচারের সাথে আঁতাত করে উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন, সেই চেয়ারম্যানগিরি ছুটে যায় স্বৈরাচারের পতনের পরপরই। তার এতোই জনপ্রিয়তা যে, ১৯৯১ এবং ২০০১'এর জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নৌকা নিয়েও তিনি পরাজিত। উনি বহুবার বহু কিছুই নির্বাচিত হয়েছেন কিন্তু সবই আঁতাত অথবা বাণের জলের মত জনসর্থন যখন থাকে সেই সময়ে তোলা ফসল। অন্যের চাচা রাজাকার ছিলেন

কিনা সেই তত্ব তৈরীতে ব্যস্ত মানুষটির নিজের বাপ-চাচারা যুদ্ধের সময় কি করেছেন সেই তথ্যটা বলতে চান না। ভুলেই যেতে চান যে, যাকে বা যাদেরকে তিনি আক্রমন করছেন, সে বা তারা এবং এই মহোদয় নিজেও একই দল করতেন এবং এটা সেই দলের ছাত্র ফ্রন্ট যারা বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর আগেও তাঁর চামড়া দিয়ে জুতা বানাতে চেয়েছিল। এই দল আশির দশকেও আওয়ামিলীগকে প্রতিদিন একবার গালি না দিলে রাত্রে ঘুমাতে পারতেন না। এখন অতি ভক্তিতে নুয়ে যাচ্ছেন, অতি ভক্তি যে চোরের লক্ষণ সেটাও ওনাদের মনে থাকেনা। বয়ান দেন, কোথাকার কোন আব্দুস সামাদ আজাদ নাকি ওনাকে হত্যা করতে চেয়েছিল। উনি যদি বাংলাদেশের ইতিহাসের আব্দুস সামাদ আজাদ নিয়ে কথা বলতে চান, তাহলে ওনার জেনে রাখা উচিৎ যে, ক্ষণজন্মা সামাদ আজাদেরা বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন থেকে ভাষা আন্দোলন হ'য়ে জয় বাংলা পর্যন্ত আন্দোলনের নেতৃত্বের মাঝেই তাদের ইতিহাস সীমাবদ্ধ রাখেননি, দেশের মানুষের অধিকার ছিনিয়ে নিতে উদ্যত দেশীয় স্বৈরাচারদের বিরুদ্ধেও ছিলেন আপোষহীন।

এই রাজনৈতিক বয়ানকারীরা সুযোগ পেলে আমাকেও ছেড়ে কথা বলবেনা। একবার তো এদেরই একজন আমাকে জাতীয় পার্টি থেকে ঐক্যফ্রন্ট পর্যন্ত পাঠিয়ে দেবার গুজব ছড়িয়েছে বেশ সফলতার সাথে, কখন আবার হাওয়া ভবনের মালিক বানিয়ে দেবে। ওহ, হাওয়া ভবনের কথা যখন এলোই, দু'টা কথা বলে নেই। দেশে নাকি কোন এক সময় হাওয়া ভবন নামে একটি ভবন ছিল, সেটার কাজ কি ছিল, কোথায় তার অবস্থান কিছুই আমার জানা নেই। সেই ভবনের মালিক হিসেবে যারা চিহ্নিত ছিল তাদের নাম দেশের বহু মানুষই জানতো, এমনকি আমাদের এই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কেউ কেউ হয়তো ব্যক্তিগত সম্পর্কও রাখতেন কিন্তু আমি বুকে হাত রেখে বলতে পারি, তাদের সাথে বা তাদের সাথে যুক্ত কারো সাথেও জীবনেও আমার দেখা বা ফোনে কথা বা কোন ধরনের যোগাযোগ পর্যন্ত হয়নি।

এতো বড় একটা জবানবন্দি দেবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে শুধুমাত্র আমার জেলা আওয়ামীলীগে গত কিছুদিন যাবৎ ঘটে চলা বিভিন্ন কর্মকান্ডে। প্রথমদিকে খুব আশান্বিত ছিলাম আমার জেলা আওয়ামীলীগকে বর্তমান সভাপতি সাহেব ঐক্যবদ্ধ করে তুলতে পারছেন ভেবে। সকলের ঈমানী ঐক্যের ঘোষনায় মনে হল, জেলা আওয়ামীলীগের সুদীর্ঘ প্রার এক যুগের বন্ধ্যাত্ব ঘুঁচবে। তারপরই শুরু হল অদ্ভুত সব কথা বার্তা। প্রথম ঘটনাটি ঘটলো বর্ধিত সভায়। কেন্দ্রীয় চার নেতার সামনে জেলা আওয়ামীলীগের একজন নেতা, দেশ ও জাতির জন্য নিজের জীবন উৎসর্গকারী, পনেরো বছর আগে যিনি মারা গিয়েছেন সেই সামাদ আজাদ সম্পর্কে খুবই অশ্রদ্ধার সাথে কিছু কথা বললেন। তার কিছুদিন পরেই দেখলাম জেলার আওয়ামীলীগ থেকে নির্বাচিত পাঁচ জনপ্রতিনিধি এক সভায় নিজেদের মাঝে সুদৃঢ় ঐক্যের কথা ব্যক্ত করে জেলা আওয়ামীলীগকে প্রতিপক্ষ বানিয়ে জেলা আওয়ামীলীগকে "তাদের" ও "তারা" সম্বোধন করে নিজেদের বিভক্তি সুনিশ্চিত করলেন। এর পরেই দেখলাম জেলা যুবলীগের এক নেতা আবার ঐ মরহুম সামাদ আজাদকেই টেনে এনে ভুল তথ্যে ভরপুর বক্তব্য দিতে।

এর পরেই আবার নতুন সমস্যা যুক্ত হল ছাতক-দোয়ারাবাজার নির্বাচনী এলাকা থেকে নির্বাচিত একজন জনপ্রতিনিধির একটি বক্তব্যকে কেন্দ্র করে। আমার বক্তব্য খুবই সামান্য। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কল্যানে ভাইরাল হওয়া উক্ত জনপ্রতিনিধির বক্তব্য আমি দেখেছি, শুনেছি। কথাগুলো খুব স্পষ্ট না হলেও বোঝা যায়। ওনার আক্রমনাত্মক কথা গুলো যেখানেই করুন না কেন, কথাগুলো বলেছেন এমন মানুষদের সম্পর্কে যাদের একজন বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা। সেই এমপি সাহেব বলেছেন, উনি বোমা মামলা খাওয়ার পর নাকি জননেত্রী শেখ হাসিনা সামাদ আজাদকে আনন্দ উৎসবের পরামর্শ দিয়ে ঢোল ঢক্কর বাজিয়ে দেশের জোকার হবার উপদেশ দিয়েছিলেন।

অপর মন্তব্যটি করেছেন বঙ্গবন্ধুর সহচর, ৭৫' পরবর্তি আওয়ামীলীগ পুনর্গঠনে যার ভূমিকা অনস্বীকার্য, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক, ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী আব্দুস সামাদ আজাদকে নিয়ে। আরে ভাই, আব্দুস সামাদ আজাদেরা গণমানুষের জন্য রাজনীতি করেছেন, আপনার মত সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে বিশ্বাসী ছিলেন না যে, আপনার মত সন্ত্রাসে বিশ্বাসী রাজনীতিবিদদের শুদ্ধ পথে আনবার জন্য তাঁরা আইনের ভাষায় কথা না বলে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কর্মকান্ডকে উস্কে দেবেন। সামাদ আজাদের যেদিন ছাতক আসবার কথা ছিল ১৯৯৯ সালে, ঠিক তার দুইদিন আগে ক্ষমতাসীন এমপি সাহেবের কি এমন প্রয়োজন দেখা দিল এতোটাই শক্তিশালী বোমা বানাবার যে, তার নিজের বাসার ছাদ শুদ্ধ উড়ে গেল। আপনি কি এমন ক্ষমতাশালী সম্রাট হ'য়ে গিয়েছেন যে আপনার কৃত অপরাধের জন্য মামলা পর্যন্ত করা যাবেনা।

তারপরও সিলেটবাসী সাক্ষী আছেন, ভরা জনসভায় আব্দুস সামাদ আজাদের পায়ে ধরে মাফ চাইবার কারণে ওনার বদান্যতায় আবার রাজনীতি করার সুযোগ পেয়ে এখন আক্রমনাত্মক কথা বলার সুযোগ পেয়েছেন। ভুল করলে ক্ষমা করার সুযোগ থাকে কিন্তু পাপের ক্ষমা তো মানুষের কাছে নেই। দুঃখ একটাই, সিলেট আওয়ামীলীগ এই ঘটনার সাক্ষী, সুনামগঞ্জ আওয়ামীলীগ তখন এই নির্বাচিত প্রতিনিধি সাহেবের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ অবস্থান নিয়েছিল কিন্তু আজ তারা নিশ্চুপ। জননেত্রী শেখ হাসিনাকে জড়িয়ে যে মিথ্যাচার উনি করেছেন সেটার বিরুদ্ধেও সাংগঠনিক কোন ব্যবস্থা না নেয়াটা খুবই বেদনাদায়ক। সমস্যা হল, এইসব ঘটনাবলী শুরু হবার কিছুদিন আগেই আওয়ামীলীগের সাথে সরাসরি যুক্ত নন এরকম একজন দেশবরেণ্য সাংবাদিক তার কলামে দূর্নীতির বিরুদ্ধে কিছু কথা বলার পর কোন এক অজ্ঞাত কারণে (যদিও ঐ কলামে কোন নাম উল্লেখ করা ছিল না, শুধুই "সুনামগঞ্জ আওমীলীগের এক নেতা" লিখেছিলেন) সেটা জেলা আওয়ামীলীগের সেক্রেটারী মহোদয় নিজের কাঁধে টেনে নিয়ে সাংবাদিক ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে জেলা আওয়ামীলীগের কার্যকরী কমিটির সভায় নিন্দা প্রস্তাব গ্রহন করে রেজোলিউশন পাশ করেছিলেন। অথচ নেতৃবৃন্দের বর্তমানের এহেনো কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে জেলা আওয়ামীলীগের কোন বক্তব্য নেই।

একটা গল্প আছে, এক চোর এসে গাছের বিশাল লাউ চুরি করে নিয়ে যাবার সময় বাগানের মালিকের জন্য খানিকটা লাউ রেখে গিয়েছিল, চোরটারও কিছু বিবেক আছে। আমার পিতা এবং তার সহকর্মীরা যে জনগনের অধিকারের জন্য সারাটা জীবন লড়াই করেছেন, সেই জনগনের অধিকার যারা চুরি করে তারা বড়ই বিবেকহীন। একারণেই পৃথিবীর আর কোন ভাষায় "কৃতঘ্ন" শব্দটির অস্তিত্ব না থাকলেও বাংলা ভাষায় আছে। কথায় বলে, "যে যায় লংকায় সেই হয় রাবণ"। তবে সকল রাবণই ভুলে যায় যে, রাবণের সাধের লংকা জ্বালাবার জন্য একটা লম্বা লেজওয়ালা হনুমানই যথেষ্ঠ। এইসব অতি সেয়ানা বোমাবাজ, হাওরের ডাকাত, বিদেশিনী, পাকিস্তানীদের শুধু আমাদের সিলেটি একটা প্রবাদ মনে করিয়ে দেয়া ছাড়া আর কিছুই বলার নেই, "সেয়ানে ডুব দিয়া হাগে ঐ গু' তার মাথাত লাগে"।

বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ বহু ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। মৌলানা ভাসানী, শেরে বাংলা, সহরোওয়ার্দি, বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া এই দল। বঙ্গবন্ধুর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ ক'রে পৃথিবীর মানচিত্রে নতুন একটি দেশ এঁকে দিয়েছে, বাঙ্গালী জাতির জন্ম দেয়া জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু এই দলের নেতা ছিলেন বলে আমরা গর্বিত। এছাড়াও এই দলে ছিলেন সৈয়দ নজরুল, তাজুদ্দিন, কামরুজ্জামান, মনসুর আলী, সামাদ আজাদের মত আত্মৎসোর্গকারী নেতৃবৃন্দ। আজকাল অনেকেই আওয়ামীলীগ করেন অথচ এই ধরনের ক্ষণজন্মা আত্মৎসোর্গকারী নেতাদের সম্পর্কে অনেক আজেবাজে কথা বলেন যেটাতে ক্ষণজন্মা মরহুম নেতাদের যেমন কিছু যাবে আসবেনা, তেমনি দলেরও কিছু যায় আসেনা অথবা যে বা যারা ঐসব আজেবাজে কথা বলছে তারাও আওয়ামীলীগ করতে পারবেন না সেটাও নয়। যদি কেউ

কিছু কথা বলেই থাকে, সেটা নিয়ে অযাচিতভাবে, না বুঝে দলীয় কোন্দল সৃষ্টি ক'রে বিষয়টিকে জটিলতার মাঝে ঠেলে দেবার সামিল। শুধু বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কেউ কিছু বললে ঝাপিয়ে পরার জন্য সকলের প্রতি অনুরোধ রইলো। অন্য সব কিছুই এখানে অবান্তর, অপ্রাসঙ্গিক, অপ্রয়োজনীয় এবং অন্য যে কোন বিষয়ে যে যা খুশী বলুক তাতে আওয়ামীলীগের কিছু যাবে আসবে না।

হাওরপারের মানুষ আমরা, হাওরপারে ঘর তুলে থাকি হাওরের বাণের জলের তোড় বুঝেই, ভেসে যাবার নয়। আমরা বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সৈনিক। বঙ্গবন্ধুর আদর্শে গণমানুষের রাজনীতির সাথে আছি, থাকবো ইনশাআল্লাহ, শুধুমাত্র সাধারণ মানুষের অধিকার আদায়ের জন্যই থাকবো।
(সমাপ্ত)